দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ .. JUL 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ২ কলাম 3 ... ...

স্থান-কাল-পাত্র

লুব্ধক

দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা তিন লাখ ত্রিশ হাজার। সরকারী ভাবে সমর্থিত এই সংবাদটিতে দেশের বেকারত্বের অভিশাপটা যে কত বিরাট ও কত ব্যাপক, তা অবশ্য প্রকাশ পাচ্ছে না। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, দেশে বেকারদের সংখ্যা ৭০ লাখ থেকে এক কোটির কিছু বেশী। এসবই কিন্তু গেষ্টিমেট। এই যে এবারে এস এস সি পরীক্ষায় যে লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী পাস করল তাদের ক'জন কলেজে ভর্তি হবে, ভর্তি হতে পারবে? যারা ফেল করেছে, তারা ছাড়াও ভর্তি হতে না পারা এই ছেলে-মেয়েগুলোর অবস্থা কি দাঁড়াবে?

এদিকে মাশাআল্লাহ আমাদের লেখাপড়ার যা ষ্টাণ্ডার্ড দাঁড়িয়েছে, তাতে এখন এসএসসি পাস ছেলে-মেয়েদের কোথায়ও চাকুরীর কোন সংস্থান নাই। মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন বলতে এখন বুঝায় এইচএসসি পাস। তাহলে এসএসসি পাসের ব্যাপারটাকে এতটা ইম্পর্টেন্ট দেওয়া হয় কেন? বিষয়টা যেখানে জাতীয় পর্যায়ে সরকারীভাবেই উপেক্ষিত, সেখানে গোটা ব্যাপারটা নতুন করে চিন্তা-ভাবনার দাবী করতে পারে বৈকি।

নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি কবে চালু হবে, আদৌ চালু হবে কিনা, কেউ বলতে পারে না। তবুও এসএসসি মান এখন যখন শিক্ষার সর্বনিম্ন মান হতে অঘোষিতভাবেই খারিজ হয়ে গেছে, তখন শুধু এর পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য বিরাট একটা বোর্ডের একাংশ পুষবার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি? সেদিন কুমিল্লা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তাঁর দাবী এসএসসি'র ১ম বিভাগের এমনকি মেধা তালিকারও অনেকের মেধা নাকি আদৌ সমমানের নয়। কিভাবে এবং কি উপায়ে অধুনা এসএসসি পরীক্ষায় কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী ১ম বিভাগ পায় কিংবা মেধা তালিকায় স্থানলাভ করে, ভদ্রলোক তার বিস্তারিত বিবরণ শোনালেন।

ভদ্রলোকের কথায় যে যুক্তি রয়েছে, তা মানতেই হবে। কিন্তু আমার বক্তব্য সেটা নয়। আমার মতে, এসএসসি পরীক্ষার দায় ও দায়িত্ব অনায়াসেই সংশ্লিষ্ট স্কুলের হাতেই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। এবং কলেজে ভর্তির ব্যাপারটায় কড়াকড়িভাবে গৃহীত ভর্তি পরীক্ষার উপরে নির্ভর করলেই হবে। ক্যাডেট কলেজসহ অনেক কলেজেই এরও কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না: কেননা সে শিক্ষায়তনে ইন্টারমেডিয়েট সাথেই রয়েছে। এর ফলে, আরেকটা সুযোগ দেখা দেবে এই যে, বহু হাইস্কুলেই তখন নিজের থেকে ইন্টারমিডিয়েট খোলায় ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

কিন্তু আমার আজকের লেখার বিষয়বস্তু শিক্ষা নয়,—শিক্ষিত বেকার। বেকারত্বের অভিশাপটা যে আসলে কি মারাত্মক, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কাউকে বুঝানো যাবে না। তার উপরে শিক্ষিত বেকারের মর্মযাতনা যে কতটা মর্মন্তুদ সেটাও শুধু লিখে কাউকে উপলব্ধি করানো সম্ভব হবে না। যদিও আমরা লেখাপড়ায় বক্তৃতা-বিবৃতিতে জোরগলায় বলে থাকি, চাকুরীটা শিক্ষা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তবুও এদেশের বেশীরভাগ মা-বাবাসহ গোটা পরিবার আশা করে থাকে ছেলে পাস করলেই চাকুরী হবে, ছেলের কর্মসংস্থান পরিবারের জীবিকার ক্ষেত্রে এনে দেবে সাশ্রয়। কিন্তু এসএসসি কিংবা এইচএসসি, সাধারণ বিএ কিংবা এম,এ; এমনকি অনার্সসহ এম,এ এম,এস-সিরাও ক্ষেত্রবিশেষে বেকারত্বের মর্মযাতনায় ভুগে থাকে।

এরজন্য প্রধানতঃ দায়ী এদেশের শিক্ষা পদ্ধতি। যদিও কারিগরি কিংবা পেশাগত শিক্ষার উপরে অধুনা জোর দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তথাপি দেশের বেশীরভাগ স্কুল-কলেজ, ভার্সিটি জেনারেল ধারায় গড়ে উঠেছে এবং সেই ধারার কোন পরিবর্তন এ যাবৎ করা হয় নাই। এদিকে দেশে প্রাইভেটাইজেশনের জিগির তোলা হলেও বাস্তবে কলকারখানা স্থাপনের তেমন কোন উদ্যোগ-আয়োজন দেখা যায় না। গেলে ছয়টা পোষ্টের জন্য ছত্রিশ হাজার দরখাস্ত পড়ে কেন?

প্রকাশ, আমাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যখন যাত্রা শুরু হয়েছিল, তখন দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল মোট এক কোটি আঠারো লাখ। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বেকারত্ব ঘুচাবার যে ওয়াদা লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা পুরাপুরি বাস্তবায়িত হলেও ৯০ দশকের শুরুতে দেশে বেকারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে সোয়া কোটিতে। বলা অনাবশ্যক যে, এই সংখ্যা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দক্ষ-আধাদক্ষ ও অদক্ষ মিলিয়েই। উল্লেখ্য যে, '৮০ সালের জনশক্তির জরিপের ফলাফল ছিল নিম্নরূপঃ মোট জনসংখ্যা ৯০ কোটি ৫ লাখ। কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ৩ কোটি ১১ লাখ। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, ১৯৮৫ সালের জুন পর্যন্ত এক কোটি ৯২ লাখ ৯০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে কৃষিতে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ১ কোটি ১৬ লাখ ৪০ হাজার, শিল্প-কলকারখানায় ৯ লাখ, পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ১৬ লাখ ৯০ হাজার, গণপূর্ত ক্ষেত্রে ৫ লাখ ৯০ হাজার, সরকারী চাকুরীতে ২০ লাখ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অপরাপর ক্ষেত্রে ১৪ লাখ ৭০ হাজার। এই অবস্থায়, আগামীতে বর্তমানের বেকার ও ভবিষ্যতের বাড়তি বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়টা জাতীয় স্বার্থেই সর্বোচ্চ অধিকার প্রাপ্তির হকদার।

দিনকয়েক আগে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের রিপোর্ট নিয়ে এই কলামে লিখেছিলাম। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে (১৯৮৭) ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইণ্ডিকেটর্স অধ্যায়ে আমাদের বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের এক চমৎকার পোষ্টমর্টেম বা সুরতহাল-এর রিপোর্ট তথ্য-পরিসংখ্যানসহ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

যেমন 'কী' শিরোনামে জিএনপি পারকেপিটা অর্থাৎ মাথাপিছু গ্রোস ন্যাশনাল প্রোডাকশনের যে ডাটা তুলে ধরা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে— বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ হচ্ছে ইথিওপিয়া। তার জিএনপি হচ্ছে— এক; দ্বিতীয় দরিদ্রতম দেশ বাংলাদেশ, তার জিএনপি ২। এমন যে আমাদের সার্কের সবচেয়ে অপরিচিত দেশ—যাকে আমাদের অনেকে আমলেই আনতে চান না, তারও জিএনপি হচ্ছে ৫। অনুরূপভাবে সার্কের অপরাপর দেশের জিএনপি নিম্নরূপঃ যেমন নেপাল ৭, পাকিস্তান ২৯, শ্রীলঙ্কা ৩০ এবং ইণ্ডিয়া ১৭। মালদ্বীপের নাম এখানে কেন যেন অনুপস্থিত।

আগেই উল্লেখ করেছিলাম যে, আমাদের দেশে কলকারখানা তেমন বাড়ে নাই। কথাটা বোধহয় পুরা সঠিক নয়। গ্রোথ অব প্রোডাকশন—টেবল ২-এ ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোস ডমেষ্টিক প্রডাক্ট-১৯৬৫—৮০ তে ছিল ২'৪; ১৯৮০—৮৫ তে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৩'৬-এ। এগ্রিকালচারেও এই উৎপাদন বৃদ্ধিটা দেখা যাচ্ছে। যেমন ১৯৬৫—৮০ তে ছিল ১'৫; ১৯৮০—৮৫তে এসে তা হয়েছে ২'৮ ভাগ। এই মুদ্দতে কলকারখানার সংখ্যাও বেড়েছে—যেমন ১৯৬৫—৮০তে ছিল ৩'৮; ১৯৮০—৮৫তে এসে তা হয়েছে ৪'৭; কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং বা পণ্য উৎপাদনের বেলায় এসে দেখা যাচ্ছে ১৯৬৫—৮০তে যা ছিল ৬'৮ ভাগ; ১৯৮০—৮৫তে এসে তা দাঁড়িয়েছে ২'০ ভাগ। সার্ভিস অর্থাৎ কর্মসংস্থানও কিছু বেড়েছে যেমন ১৯৬৫—৮০তে ছিল ৩'৪ ভাগ; তা ১৯৮০—৮৫তে এসে দাঁড়িয়েছে ৪'৩ ভাগে।

এই হিসাব গ্রহণের বেলায় কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এই মুদ্দতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। বিশ্ব ব্যাঙ্কের এই ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টেই প্রথম প্রকাশ পেল যে, আমাদের জনসংখ্যা ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝিতেই ১০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে—রিপোর্ট অনুযায়ী ওই সময়ে এদেশের জনসংখ্যা ছিল ১০ কোটি ৬০ লাখ। এই বাড়তি জনসংখ্যা নিয়ে বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু আয় ১৫০ ডলার মাত্র, ভুটানের ১৬০ ডলার, নেপাল-১৬০ ডলার, ইণ্ডিয়া ২৭০ ডলার, পাকিস্তান ৩৮০ ডলার এবং শ্রীলঙ্কা ৩৮০ ডলার।

সুতরাং জনসংখ্যার বিচারে প্রোডাকশন—উৎপাদন ইত্যাদির বিচারে আমরা এগিয়েছি না পিছিয়েছি—তার একটি চুলচেরা বিচার হওয়া দরকার। সবচেয়ে বেশী বিশ্লেষিত হওয়া দরকার আজ এই মুহূর্তে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করল তার ঘাড়ে যখন ২০০০ ডলার বিদেশী ঋণের বোঝা চেপে রয়েছে, সেখানে আমরা উন্নতিটা করছি ঠিক কোন্‌খানে? এই যে প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকার মত বৈদেশিক ঋণ-দান-অনুদান এসেছে, তার হিসাব যদি সঠিকভাবে নেওয়া যেত তাহলেই দেখা যেত, সেগুলি কোন্ কোন্ খাতে খরচ হয়েছে এবং কেন সে খরচ দেশটাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যতটা এগিয়ে নিয়েছে উন্নতির পথে ততটা এগিয়ে নিতে পারে নাই।

সুতরাং দেশে ৩ লাখ ৩০ হাজার শিক্ষিত বেকারের হাহাকার শুধু যে তাদেরই আহাজারি তা মনে করার কোন কারণ নাই। বরং তা সামগ্রিকভাবে সমগ্র দেশবাসীরই আর্তনাদ। বিশ্বব্যাঙ্কও যে সে আর্তনাদের দায়ভাগী, তা এর আগের আলোচনায় উল্লেখ করেছি এবং বিশ্বব্যাঙ্কের আন্তর্জাতিক আমলাদের যোগসাজশে কিভাবে এতদ্দেশীয় কোন কোন আমলা এর জন্য সমানভাবে দায়ী সে আলোচনায় সেটাও নিরূপণ করার প্রয়াস পেয়েছি। সুতরাং পুনরাবৃত্তি বাহুল্য বোধে এ নিবন্ধের এখানেই ইতি টানতে হচ্ছে।